The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 83 - 98)
Published in February, 2025

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

মোঃ জাকির হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রাক-প্রাথমিকসহ) ২,০১,০০,৯৭২ জন শিশু শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে শহর-বন্দর-নগর এলাকার চেয়ে মফস্বল-বস্তি-গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করছে বেশি। আর তাদের অধিকাংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের ৯৩% অপুষ্টির শিকার এবং শুধু শক্তি ঘাটতিই নয় তারা প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতিতেও ভুগছে। এসব শিশুর পড়ালেখায় মনোযোগ দেওয়া এবং শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রতিনিয়ত কষ্ট করছে অথবা তারা ঝরে পড়ছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর সব ধরণের গুরুত্ব দেওয়ার পরেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। ২০০১ সালে দারিদ্র্যপীড়িত একটি এলাকায় 'World Food Organization' স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করলে 'জাদুকরি' ফলাফল অর্জন করে। প্রথম ঘণ্টায় তারা বাংলাদেশের তৈরি একপ্যাকেট বিস্কুট শ্রেণি কক্ষে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। এ কার্যক্রমটি একটি অভিনব সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, স্কুল পালানো ও ঝরে পড়ার হার কমতে থাকে। এই বিস্কুটের মাধ্যমে শিশু প্রতিদিন ৩৩৮ কিলোক্যালোরি শক্তি পায়। WFP এর সাফল্যে বাংলাদেশ সরকার উচ্ছ্বসিত হয়ে ২০০৯ সালে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং- এর জাতীয় কর্মসূচি চালু করে। বর্তমানে WFP ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১০৪টি উপজেলার ৩০ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও বিস্কুটের পরিবর্তে মধ্যাহ্নে সবজি খিচুড়ি/ডিম খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তিহার, উপস্থিতি, শিক্ষাচক্র সমাপনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঝরেপড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা: পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এই অধিকার বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় (Formal education) প্রথম ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। এইটি শিক্ষার ভিত্তি। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তিভূমি। শিশু শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাকে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্‌বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনধারণের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো বিশ্বায়নের এইযুগে শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে উজ্জীবিত করা। আদর যত্ন স্নেহ ভালোবাসায় শিশু শিক্ষার্থীদেরকে সিক্ত করে শিক্ষা নামক মহাসড়কের শেষ প্রান্তে পৌঁছার দিকনির্দেশনা দেওয়া। বস্তুত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন যুগের সূচনা হয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যুগোপযোগী বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এটির উদ্দেশ্য কৌশল পরিকল্পনা নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করা হয়। নতুন জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রাগসর মানবসম্পদ

* সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গড়ে তোলার প্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১৫ (ক), ১৬, ১৭, ২৮(৩) ও ৪১ (২) ধারায় শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হলেও অনুচ্ছেদ ১৭ তে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে-
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।- রাষ্ট্র-

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন (বাংলাদেশের সংবিধান ৭)।

নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সরকারের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুতপক্ষে এর সমস্ত কৃতিত্বই বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর সরকারের। তাঁরই হাত ধরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার নবজাগরণের সূচনা করে। রাষ্ট্রপতি ২৬ শে অক্টোবর ১৯৭৩-এ, এক অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৩ সালে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এটি 'The primary schools (Taking over) Ordinance 1973' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে উক্ত অর্ডিন্যান্সটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করা হলে সংসদে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। এটি 'The primary schools (Taking over) Act 1974' নামে খ্যাত। উপর্যুক্ত আইনের আওতায় ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৫,০২৩ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয় (হালদার ৩৭-৪১)। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আপামর জনগণের নিকট সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি ও যথাযথ মর্যাদা লাভ করে। দীর্ঘদিন পর ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক 'প্রাথমিক শিক্ষা আইন' পাস হলে ১৯৯২ সালে ৬৮টি উপজেলায় প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্পটির সফলতায় সমগ্রদেশে তা বিস্তার লাভ করে। ২০০০ সালের এপ্রিলে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার করে যে, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে (হালদার ৮৭)।

গবেষণা সমস্যা: দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং শ্রেণিকক্ষে তাদের উপস্থিতি ধরে রাখা সমস্যা হিসেবেই থেকে যায়। দারিদ্র্যতার সঙ্গে বসবাসকারী পরিবার তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় তারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে গৃহকর্মে সাহায্য করছে। আর যেসব শিশু বিদ্যালয়ে যায় তারা প্রায়শই ক্ষুধা নিয়ে যায়। ফলে শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাদের ঝরেপড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাড়া, সব অর্থনৈতিক স্তরের শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টির ঘাটতিতে ভোগে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ঝড় বন্যা বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। ২০০০ সালে প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জরুরি সহায়তার অংশ হিসেবে WFP (World Food Programme) ২০০১ সালে 'বাংলাদেশ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' চালু করে। WFP এর কর্মকর্তাগণ ত্রাণ বিতরণের সময় লক্ষ্য করে যে, সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারের শিশুরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যায় না। এমতাবস্থায় তাদের কর্মীরা শিশুদের বিদ্যালয় যেতে একপ্যাকেট পুষ্টিকর

বিস্কুট বিতরণ করে। যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত 'মেইড ইন বাংলাদেশ' বিস্কুট। এ কার্যক্রমটি একটি অভিনব সমাধান হিসেব আবির্ভূত হয়। প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে স্বল্পকালীন ক্ষুধা মেটানোর কাজে 'জাদুকরি' ভূমিকা রাখে (প্রতিবেদন ২০১২, ১৫)। ফলে গবেষক উপর্যুক্ত বিষয়টি গবেষণা হিসেবে বেছে নেন।

গবেষণা পদ্ধতি: উপর্যুক্ত গবেষণাটি দ্বারা বাংলাদেশের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, WFP এর প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইটের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। ফলে এটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি।

গবেষণার উদ্দেশ্য: 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিহারে কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা তার যাচাই:
- শিশু শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণে কার্যক্রমটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা নির্ণয়;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে ইতিবাচক কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা অনুসন্ধান;
- প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষায় পাশের হারের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ফলে ঝরে পড়ার হার সনাক্তকরণ;
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ;
- ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সুপারিশ।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য:

- স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে জাতিসংঘের এমডিজি-২ বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ (millennum development goal MDG) এর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখা। যথা-
- এমডিজি- ২ এর প্রধান লক্ষ্য- ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব জায়গার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করতে সক্ষম হবে।
- এমডিজির লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে নীট ভর্তিহার ১০০ শতাংশে উন্নীত করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালে ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচির স্বল্পকালীন লক্ষ্য:

- খাদ্য নিরাপত্তাহীন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো;
- অপুষ্টির ঘাটতি কমিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিখন সার্মথ্যের উন্নয়ন ঘটানো;
- দক্ষ এবং কার্যকরভাবে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (প্রতিবেদন ২০১২ , ১৫)।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০০৩ সালে WFP স্কুল ফিডিং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দুর্যোগ কবলিত এলাকা থেকে উত্তরাঞ্চলে যা স্থানীয়ভাবে 'মঙ্গা' নামে পরিচিত এলাকায় সম্প্রসারণ করে। তবে বিস্কুটের পুষ্টিগুণ ঠিক রেখে ১০০ গ্রাম থেকে ৭৫ গ্রামে নামিয়ে আনা হয়। এসময়ে সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১.২ মিলিয়নে পৌঁছায়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ২০০৫-০৬ মেয়াদে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকা থেকে WFP স্কুল ফিডিং গুটিয়ে নেয়। অবশ্য ২০০৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং চালু করে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর বন্যা আক্রান্ত এলাকায় WFP জরুরি স্কুল ফিডিং সম্প্রসারণ করে। ২০০৮-০৯ সালে ঢাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয় (প্রতিবেদন ২০১২, ১৫)।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং-এর জাতীয় কর্মসূচির সূচনা করে। ২০১০ সালে একনেক (ECNCE) দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি অনুমোদন করে। সরকার ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী প্রায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে উচ্চপুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করে। ২০১২ সালের অক্টোবরের মধ্যে সরকার ১.৪ মিলিয়ন বিদ্যালয়গামী শিশুকে সহায়তার আওতায় আনে। WFP ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০১২ সালের শেষ অবধি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার মোট ২.৫ মিলিয়ন শিশু এই কর্মসূচির আওতায় আসে (প্রতিবেদন ২০১২, ১৯)।

প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরন:

- প্রকল্পভুক্ত উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ)
- প্রকল্প এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভুক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়:
- প্রকল্প এলাকায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

স্কুল ফিডিং-এ, কেন বিস্কুট? কী রয়েছে এই বিস্কুটে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়-

- স্কুল ফিডিং মডেল হচ্ছে জনপ্রিয় গণচাহিদা সম্পন্ন কার্যক্রম।
- উচ্চপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে।
- অভিভাবকেরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী হন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ায়।
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনকার পুষ্টির যোগান দেয়।
- শ্রেণি শিখনের ক্ষমতা বাড়ায়। শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়।
- এটির অপচয় হয় না।
- স্কুল ফিডিং মডেল ব্যয়সাশ্রয়ী ও ব্যবস্থাপনা সহজ।
- কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) ও অভিবক- শিক্ষক (PTA) সংশ্লিষ্টাতার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান করা সহজ (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১৪)।

- এই বিস্কুটের মাধ্যমে শিশু প্রতিদিন ৩৩৮ কিলোক্যালরি শক্তি পায়, যা তার অণুপুষ্টি চাহিদার ৬৭% পূরণ করে। এতে রয়েছে-

  ৬৯% উন্নতমানের গমের আটা
  ১৩% উদ্ভিদ চর্বি
  ৬ % ফুল ফ্যাট সয়াফ্লাওয়ার
  ১২% চিনি এবং প্রয়োজনীয় লবণ।

পুষ্টিগুণের মধ্যে আছে-

ভিটামিন এ
ভিটামিন বি১ বি২ বি৫ বি ৬ ও বি ১২
ভিটামিন সি
ভিটামিন ডি৩
ভিটামিন ই, আয়োডিন ফলিক এসিড নিকোটিন এমাইড আয়রন ও জিঙ্কের উপাদান। এই পুষ্টি উপাদান শিশুকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করে। শেখায় সামর্থ্য বাড়ায় (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১১)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচির প্রকল্প সংশোধনীর বিবরণ:

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্ম এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরূপ:

মূল ডিপিপি :

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৪২৭৯.৯১ (জিওবি: ৫৯৭৭০. ৫৭ প্রকল্প সাহায্য: ৫৪৫০৯.৩০) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪।

১ম সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি : ৮৭৫৭৪.৫০ প্রকল্প সাহায্য : ৭০২১৮.৬১) মেয়াদ: জুলাই ২০১০ ডিসেম্বর ২০১৪।

২য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট : ৩১৪৫৫২.২০ (জিওবি : ২১৪৫৯৯.৬৫ প্রকল্প সাহায্য : ৯৯৯৫২.৫৫) মেয়াদ : জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭।

৩য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট : ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি : ৩৭৩৭০৬.৮২ প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০২০ (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪১)।

অর্থবছর অনুযায়ী প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
সারণি-০১
(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	২৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬%
২০১৮-১৯	৪৫৬০০.০০	৬২১০.০০	৫১৮১০.০০	৪২০৬৭.৮৪	৬২০৮.২৭	৪৮২৭৬.১১	৯৩.১৮%
২০১৯-২০	৩৯৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৬০০০.০০	৩৮৯৪৫.৭০	৬৫০০.০০	৪৫৪৪৫.৭০	৯৮.৮০%
২০২০-২১	৪৯৭৯৮.৮৪	৬২১৫.০০	৫৬০১৩.৮৪	৪৮৬৪৮.৭৯	৬২১৫.০০	৫৪৮৬৩.৭৯	৯৭.৯৫%

উৎস : *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পৃ. ২৫, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১* প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.৩৬।

উপর্যুক্ত সারণিতে- দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার ও সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো স্কুল ফিডিং কার্যক্রম MDG-2 (২০১৫) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরে ৪১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ৪১৭৭৯.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ২০২০-২১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৮৬৩.৭৯ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে ব্যয়ের ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বেড়েছে। ঝরে পড়ার হার কমেছে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনী হারও বেড়েছে। নীট ভর্তিহারে সবিস্তার ঘটেছে।

২০০১ সাল থেকে WFP এর স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমে নীট ভর্তিহার নিম্নরূপ-

সারণি-০২

সাল	নীট ভর্তিহার
২০০৫	৮৭.২%
২০০৬	৯০.৯%
২০০৭	৯১.১%
২০০৮	৯০.৮%
২০০৯	৯৩.৯%

সূত্র: *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ*, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.১১

২০১০ সাল থেকে WFP ও বাংলাদেশ সরকার যৌথ ও এককভাবে বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের ফলে ভর্তিহারে প্রভাব পড়ে। যথা-

সারণি-০৩

সাল	নীট ভর্তিহার		
	বালক	বালিকা	মোট
২০১০	৯২.২০	৯৭.৬০	৯৪.৮০
২০১১	৯২.৭০	৯৭.৩০	৯৪.৯০
২০১২	৯৫.৪০	৯৮.১০	৯৬.৭০
২০১৩	৯৬.২০	৯৮.৪০	৯৭.৭০
২০১৪	৯৬.৮০	৯৮.৮০	৯৭.৭০
২০১৫	৯৭.১০	৯৮.৮০	৯৭.৯০
২০১৬	৯৭.০১	৯৮.৮০	৯৭.৯৬
২০১৭	৯৭.৬৬	৯৮.২৯	৯৭.৯৭
২০১৮	৯৭.৫৫	৯৮.১৬	৯৭.৮৫
২০১৯	৯৭.৬৫	৯৮.০১	৯৭.৩৪
২০২০	৯৭.৩৭	৯৮.২৫	৯৭.৮১
২০২১	৯৭.৩৯	৯৭.৪৪	৯৭.৪২

সূত্র: *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ২২।

উপর্যুক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, MDG-2 অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য প্রায় পূরণ হয়েছে। ২০১৫ সালে ভর্তি হার ৯৭.৯০% এ, উন্নীত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ফলে ২০২১এ, ভর্তি হার ৯৭.৪২% এ, নেমেছে।

সারণি-০৩ চিত্রে প্রদর্শিত হলো:

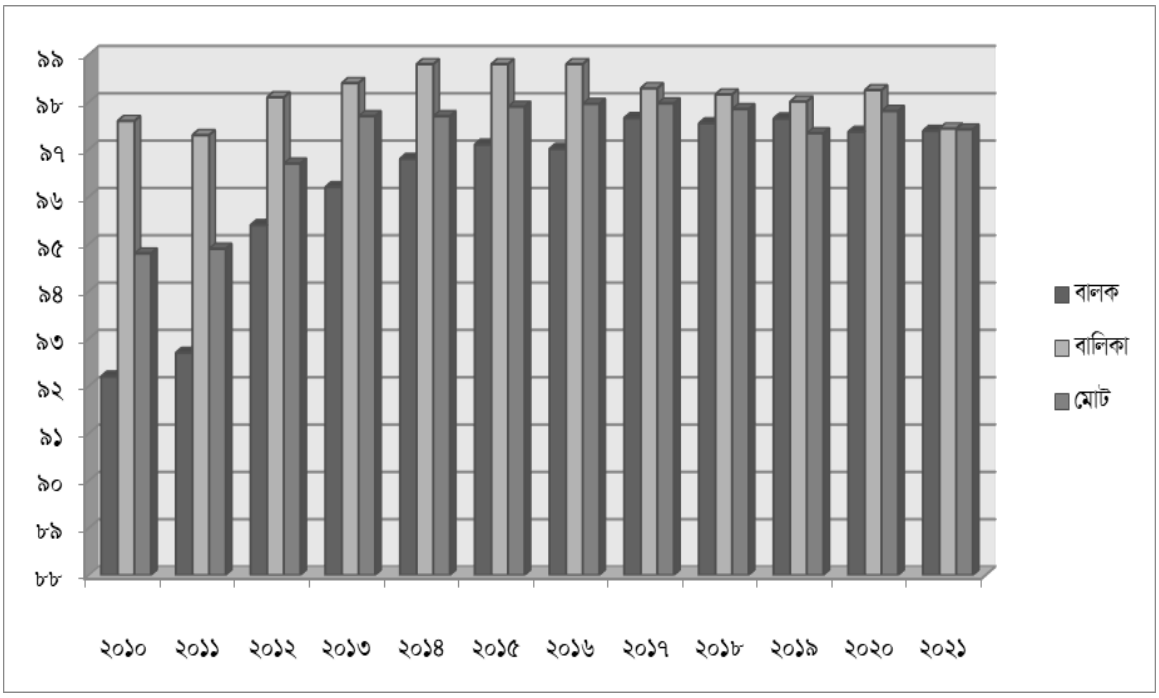

চিত্র-১: ভর্তি হার বৃদ্ধি

WFP এর স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ধীরে ধীরে কমছে:

সারণি-০৪

সাল	ঝরে পড়ার হার
২০০৫	৪৭.২%
২০০৬	৫০.৫%
২০০৭	৫০.৫%
২০০৮	৪৯.৩%
২০০৯	৪৫.১%

সূত্র: *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ*, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ১২।

বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর যৌথ প্রচেষ্টায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের ফলে ঝরে পড়ার হার নিম্নরূপ-

সারণি- ০৫

ঝরে পড়ার শতকরা হার	সাল	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
	বালক	৪০.৩	৩২.৪	২৮.৩	২৪.৯	২৪.৩	২৩.৯	২২.৩	৩১.৭২	২১.৪৪	১৯.১	১৫.০৫	১৫.০৫
	বালিকা	৩৯.৩	২৭.০	২৪.২	১৭.৯	১৭.৫	১৭.০	১৬.১	১৫.৯২	১৫.৬৯	১৫.৭	১৫.৫	১৩.২৫
	মোট	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮৫	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৪.২৫

সূত্র: *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২*, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ২৩।

সারণি- ০৫ অনুযায়ী MDG-2 এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় তার কাঙ্ক্ষিত প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালে ঝরেপড়ার হার ২০.৪% এ, উন্নীত করেছে। যা ২০২১ এ, ১৪.২৫% অর্জন করেছে। সারণি-০৫ নিম্নোক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হলো-

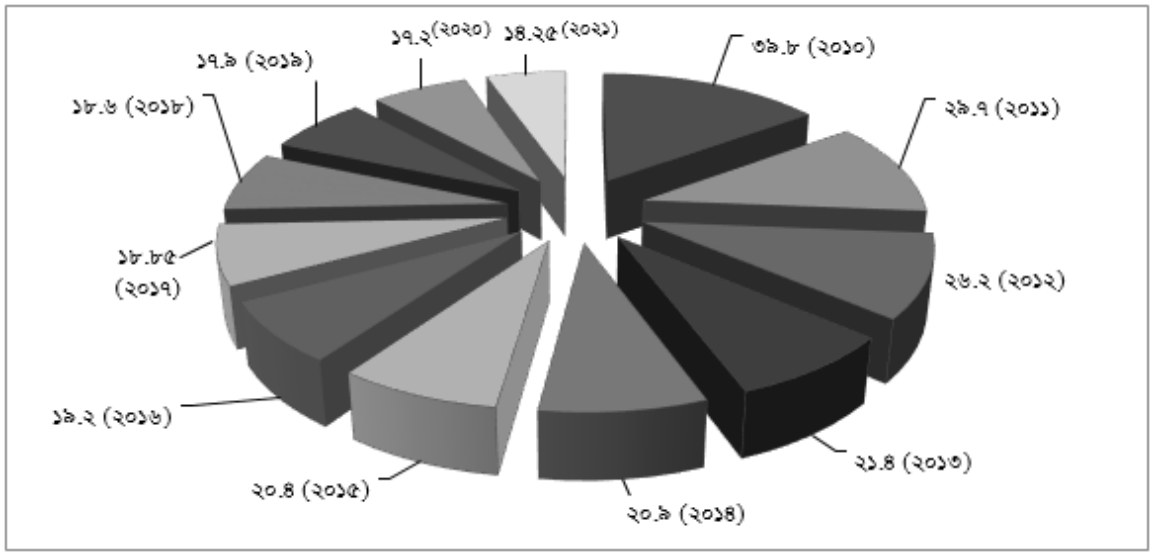

চিত্র-২, ঝরেপড়ার হার হ্রাস

সারণি- ০৬

প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার-

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
প্রাথমিক শিক্ষাচক্র হার	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৪	৮২.১	৮২.৮	৮৫.৮৫

সূত্র : *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.২৪।

উক্ত সারণি-০৬ এ, লক্ষ্য করা যায়, ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার ৭৯.৬% যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি। ২০২১ এ, ৮৫.৮৫% উন্নীত হয়েছে। চিত্রে সারণি-০৬ উপস্থাপিত হলো:

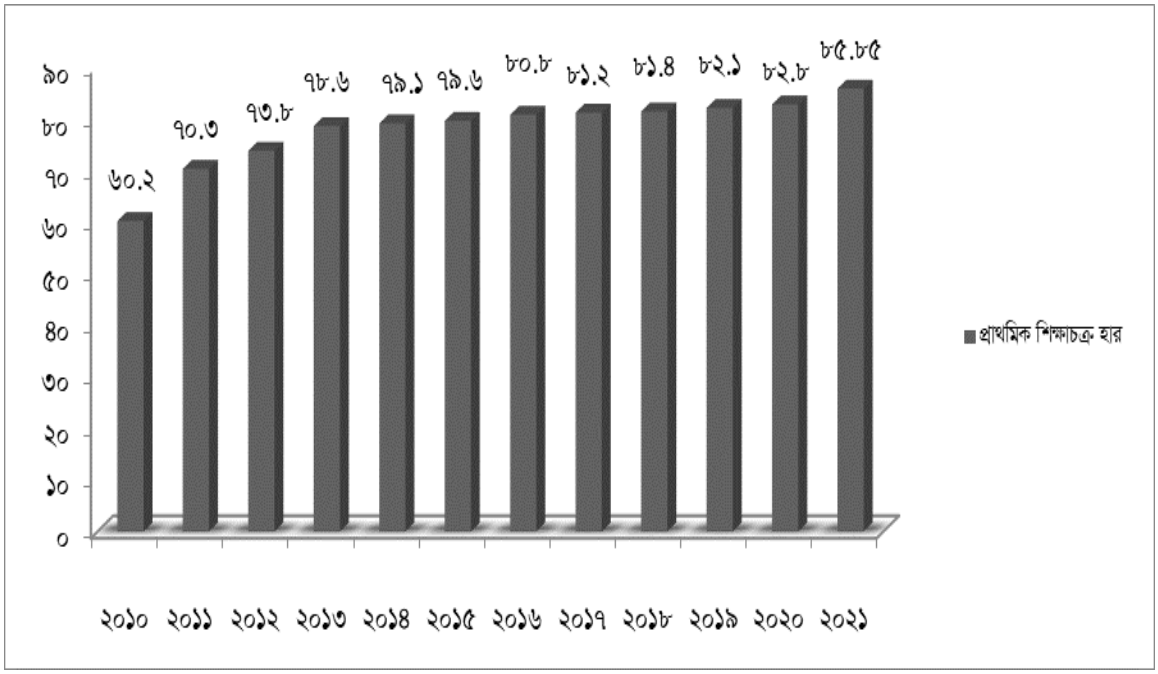

চিত্র-৩, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার বৃদ্ধি।

প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। যথা-

সারণি-০৭

সাক্ষরতার হার-

সাল	১৯৭২	২০০২	২০০৮	২০১৩	২০১৫	২০২০
সাক্ষরতার হার	৩০	৪৮.৪	৫৪.৪	৫৯.৪	৬২.৩	৭৫.৬

সূত্র : *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ১০ ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৪৮।

সারণি-০৭ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৯৭২ সালে সাক্ষরতার হার ছিলো ৩০% যা ২০১৫ এ, ৬২.৩% এবং ২০২০ এ, ৭৫.৬% এ, উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের অবদান রয়েছে। চিত্রে তা উপস্থাপিত হলো-

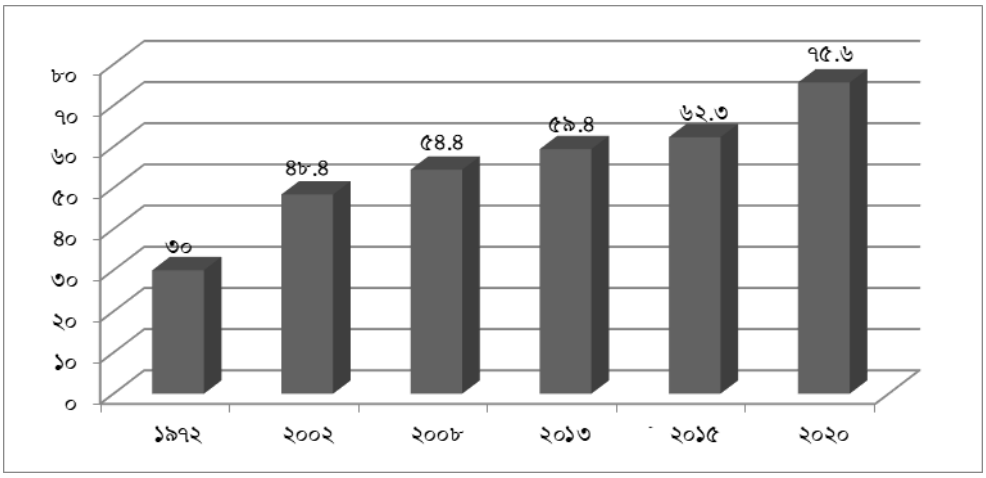

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা:

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ে সকল চাহিদা পূরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্কুল মিল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রম পরিচালনা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ' জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' প্রণয়ন করেছেন। প্রণীত এ নীতির আলোকে স্কুল মিল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার (SDG-4) লক্ষ্যমাত্রা ও ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে। কেননা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার-

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মমত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ (প্রতিবেদন ২০২১-২২, ১২)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে শিক্ষায় সকল ধরণের বৈষম্য নিরসন, শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি ও শিখনফল অর্জন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখা সম্ভব। কেননা টেকসই উন্নয়ন ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ (মিল নীতি ২০১৯, ২)।

'জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' অনুযায়ী দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি উপজেলায় অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৪,১০,০০০ শিক্ষার্থীকে বিস্কুটের পরিবর্তে 'মিড ডে মিল' তথা রান্না করা গরম গরম সবজি খিচুড়ি ও ডিম খিচুড়ি সরবরাহ করা হয়েছে (প্রতিবেদন ৪১)। স্কুল মিলের খাদ্যবৈচিত্র বৃদ্ধি ও খাবারের স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে পুষ্টিচাল (fortified rice) ডাল, পুষ্টিতেল (fortified vegetable oil) ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন মৌসুমী তাজাসবজি এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে ডিম দিয়ে তৈরি খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকে একদিন উচ্চপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট ও অন্যান্য দিন রান্না-করা খাবার দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৫)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি থেকে অর্জিত ফলাফল :

- ২০১২ সালে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ২.৫ মিলিয়নের বেশি বিদ্যালয়গামী শিশুর কাছে পৌঁছেছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিহার ১৬% বেড়েছে।
- শিশুদের আয়রণ উপদানের ঘাটতি কমেছে ১২%।
- উপস্থিতির হার ৮%-১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঝরেপড়ার হার কমেছে ৬%।
- ইতিবাচক শিখন (Learning) পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।
- অভিভাবক মহলে একটি কার্যকর প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে।
- প্রাথমিক সমাপনের হার ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বচ্ছভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সরকার ও স্থানীয় কমিউনিটি এই কর্মকাণ্ডে বেশ আন্তরিক।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর মধ্যে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর অংশীদারিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে (প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, ৩৬)।
- ৩০ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীকে স্কুল মিল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ৩৮)।
- প্রকল্পের আওতায় যে সকল এলাকায় হোম গ্রোন স্কুল মিল বা মিড ডে মিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সকল এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় নারী উৎপাদনকারী সৃষ্টি হয়েছে, এতে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- সরকারি অংশে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ৩৭)।
- প্রকল্পভুক্ত প্রায় ৬২% বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী সবজি বাগান গড়ে উঠেছে। ক্লাস বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাগান পরিচর্যা করে। যেসব বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত চাষ উপযোগী জায়গা নেই; সেসব বিদ্যালয়ের ছাদে টবে সবজির চাষ হচ্ছে। এতে স্থান পেয়েছে টম্যাটো, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, লাউ, মরিচ, পেয়ারা ইত্যাদি। ফলে শিক্ষার্থীরা সবজি বাগান কার্যক্রমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয় ও বাড়িতে সবজি বাগান তৈরিতে মনোনিবেশ করছে।
- ৮৪% বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে।
- ৯১% বিদ্যালয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।
- ৮৮% শিক্ষার্থী জুতা-স্যান্ডেল পরে স্কুলে আসে।
- প্রায় ৭৮% শিক্ষার্থী টিফিন-বক্স ব্যবহার করছে।
- ৮৭% বিদ্যালয় কমিউনিটি মবিলাইজেশন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ২১)।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ) ২,০১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুর সংখ্যা কমপক্ষে ৪,১৪,৪৮০ জন (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১০)। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩০,০০,০০০ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী। ১,৭১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী এই সুবিধার বাহিরে রয়েছে।
- বিস্কুট বা প্রদেয় খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা।
- বিস্কুট ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্থান সংকুলান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।
- দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সরকারের ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করা।
- প্রকল্প কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। যেখানে সমগ্রদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১,১৮,৮৯১টি। নিঃসন্দেহে এটি বিশ্বের অন্যতম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। দুই দশকেরও বেশি আগে শিক্ষাকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার জোরালো অঙ্গিকার এবং সন্তোষজনক সফলতার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ১৫)।

সুপারিশ : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নিম্নরূপ:

- শুধুমাত্র ৩৫টি জেলার ১০৪টি উপজেলার দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা ছাড়াও অন্যান্য দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।
- শিক্ষা বাজেট কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করে প্রাথমিক শিক্ষায় অধিক বরাদ্দ দেয়া জরুরি। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার্থীর বরাদ্দ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-০৮

অর্থবছর	শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
১৯৭২-৭৩	৪৪
১৯৮০-৮১	১৪২
১৯৯০-৯১	৬১১
২০০১-০১	১,৫৫৯
২০১০-১১	৪,৭৬৯
২০২০-২১	১২,৩৯৪

সূত্র: মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, *৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা*, ঢাকা: আদর্শ, ২০২২, পৃ.৬৮।

সারণি-০৮ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বছর বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি জরুরি।

- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম ধীরে ধীরে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর জন্য রাজস্ব আয় বাড়াতে প্রচারণা জোরদার করতে হবে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা এবং জাতীয় অথনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের একই ছাতার আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও বিশেষভাবে অনগ্রসর নারীদের কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, সে জন্য একটি টেকসই মডেল প্রণয়ন জরুরি।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা ও নিয়মিতভাবে তা বাস্তবায়ন করা।

- স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের মূলধারায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কর্মপরিচালানা গ্রহণ করা।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় স্বচ্ছল ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমটি শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে নিরক্ষরতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে । দেশের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য বস্তি রয়েছে। এসব আলোকোজ্জ্বল শহর-নগরীতে মানব শিশু থাকতে বাধ্য হলেও তারা পাচ্ছে না শিক্ষার আলো, না পাচ্ছে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। এমতাবস্থায়,এই প্রকল্পে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সময়ের দাবি মাত্র।

উপসংহার : বাংলাদেশে স্কুল ফিডিং বাস্তবায়নে যেসব দেশকে মডেল হিসেবে ধরা হচ্ছে তার মধ্যে বৃটেন, ভারত ফিনল্যান্ড অন্যতম। শিক্ষাবিদগণের ভাষ্য, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে মধ্যাহ্ন খাবার দেওয়া প্রায় স্বাভাবিক ও প্রচলিত একটি নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত। কোনো কোনো দেশ স্কুল মিলকে অবৈতনিক শিক্ষার একটি অংশ হিসেবে গণ্য করছে। আবার কিছু কিছু দেশ এ কার্যক্রমকে শিশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও মেধাবিকাশ তথা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গুনগতমান উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করছে। এছাড়াও আরো কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে বিনামূল্যে খাবার বিতরণকে স্কুল শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধি ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছে। ভারতে প্রতিদিন ২০ কোটি শিশুকে স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। ব্রাজিলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির নানামুখী উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যালয়ে রান্নার প্রয়োজনীয় সবজিসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য এলাকায় এলকায় গড়ে উঠেছে কৃষি খামার। এর মাধ্যমে ব্রাজিলের কৃষি ব্যবস্থা পাল্টে গেছে (daily.janakhantha.com)। বাংলাদেশকে উপর্যুক্ত দেশগুলোর সফলতা বিবেচনায় রেখে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে প্রাথমিক শিক্ষায় আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ*, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ২০১৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯।*

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, World Food Programme।

হালদার, বিমেলেন্দু, *বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা অতীত ও বর্তমান*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

সালাহউদ্দিন, মুহাম্মদ, *৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা*, আদর্শ, ২০২২।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর, *প্রারম্ভিক শিক্ষা বিজ্ঞান*, প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০২০।

http://stp.dpe.gov.bd

daily.janakhantha.com